আঞ্চলিক বৈষম্য বনাম বিভেদকারী আঞ্চলিকতাবাদ

আঞ্চলিক বৈষম্যের সূত্র ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের রুপরেখা রচিত হয়েছিল — আজ সেই স্বাধীন দেশেই আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠ সমাজ অগ্রগতির প্রয়োজনে সাধারনভাবেই অর্থনীতিক বৈষম্য কাম্য নয়। তদুপরি, সে বৈষম্য আঞ্চলিক ব্যপ্তি নিলে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিভেদ-মুখী ধারা প্ররোচিত হবার সম্ভাবনা বাড়ে। আজকের আলোচনায় বাংলাদেশ মূখ্য। বৈষম্যের বহুবিধ প্রকাশ রয়েছে — এ নিবন্ধে ধনী-গরীব বা জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ থাকবে না - কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। মূলতঃ অর্থনীতিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকায় সম্পদের আঞ্চলিক বন্টনের রাজনীতি সঙ্গতভাবেই উত্থাপিত হয়েছে।

মোট দেশজ উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে, বা সেসবের প্রবৃদ্ধির আলোকে বৈষম্য যাচাই সম্ভব। জেলা পর্যায়ে সেসব তথ্য মাঝেমধ্যে পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশ করলেও সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়না। নব্বুইয়ের দশকের শুরু থেকে দারিদ্র্যের পরিমাপের ভিত্তিতে অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রথা শুরু হয়। কোনও এক জনগোষ্ঠীর শতকরা কত অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে এবং গড় ভোগের পরিমান কত — এদুটো তথ্য প্রতি পাঁচ বছর পরপর (থানার আয়-ব্যয়ের) জরীপের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে সেসবের পরিমাপই আঞ্চলিক বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা দেয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে ঘিরে মঙ্গা'র আলোচনা দীর্ঘকাল চললেও ১৯৯৫-৯৬ এর (আয়-ব্যয়) জরীপের পর আঞ্চলিক ভেদাভেদের তথ্যভিত্তিক আলোচনার সুযোগ তৈরী হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা'র উদ্যোগে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দারিদ্র্য মানচিত্র প্রস্তুত হয়, যা খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য বিতরণ কর্মসূচী পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব রেখেছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় যে পূর্বের তৈরী মানচিত্র উপকূলীয় দক্ষিনাঞ্চলের দূরাবস্থা যথার্থভাবে ধরতে পারেনি — এমনকি, ২০০৫ এর জরীপের ফলাফল জানার পরও সাহায্য সংস্থা, সরকার ও সুশীল সমাজের মাঝে এবিষয়ে বোধদয় হতে 'সিডর' ও 'আইল্যা'র মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

বিভিন্ন জরীপ-তথ্য তুলনা করে জানা যায় যে, নব্বুইয়ের শুরুতে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার সর্বাধিক ছিল। নব্বুইয়ের শেষাংশে বরিশালে সেই হার অনেক হ্রাস পায় যা দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে বরিশালকে স্থবির খুলনার কাতারে আনে, এবং এ শতাব্দীর শুরুতে এদুটো বিভাগেই স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। অথচ, যমুনা সেতু চালু হবার পর রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যের হার উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পায়। যদিও ২০০৫ সনের জরীপের তথ্যানুযায়ী উল্লেখিত তিনটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার প্রায় সমান, অগ্রগতি ও সম্ভাবনার আলোকে অনেকেই মনে করেন যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং উপকূলীয় দক্ষিনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এসবের তুলনায় সামগ্রিক চিত্রে সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্যের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো'র জরীপ কেবল বিভাগ পর্যায়ে দারিদ্র্য-হারের গ্রহণযোগ্য পরিমাপ দিতে পারে, যার মূল ফলাফল উপরে উল্লেখ করা হলো। তবে, মাঠ-পর্যায়ের তথ্য, থানা-ভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণ এবং দারিদ্র্য-মানচিত্রের ভিত্তিতে এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, মঙ্গা-পীড়িত নদী-ভাঙ্গনের এলাকা, নেত্রকোনা-সিলেটের হাওড়-এলাকা, আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চল এবং খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রামের উপকূলীয় দক্ষিনাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বেশী।

গত দু-তিন বছর আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। আমি দুটো চিন্তা-ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। বিশ্ব ব্যাংক-এর ২০০৮ সনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুর্ব-পশ্চিম বিভাজনের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির মূল দুটো মেরু — ঢাকা ও চট্টগ্রাম — পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এবং যমুনা ও পদ্মা নদী-সৃষ্ট ভৌগলিক বিভেদের কারণে পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এলাকা উক্ত দুটো মেরুর প্রবৃদ্ধির সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের অনেক চিন্তাবিদদের মাঝে সমধর্মী অপর একটি চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, যা নিম্নোক্ত উক্তিতে ধরা পড়েঃ 'মঙ্গা-পীড়িত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দারিদ্র্যের কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিনাঞ্চলে সরে গিয়েছে'। শুনে মনে হয় দারিদ্র্য যেন এক প্রাকৃতিক দূর্যোগ যা অতীতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানতো এবং বর্তমানে দক্ষিনে আঘাত হানছে! বলার অপেক্ষা রাখে না, উভয়ক্ষেত্রে নীতি-পরামর্শে সাদৃশ রয়েছে — দরিদ্র মানুষের 'নিরাপত্তা বেষ্টনী'র জন্য সাহায্য-সম্পদ বন্টনে এখন থেকে দক্ষিনাঞ্চলকে প্রাধাণ্য দিতে হবে। এমন মানবিক অনুভূতি-সম্পন্ন প্রস্তাবনা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। তবে আবেগের ধূম্রজালে আমাদের উন্নয়ন-ধারা ও তদসৃষ্ট বৈষম্যের হেতু'র প্রতি অন্ধদৃষ্টি রাখলে ভুল হবে। আর কারণ খুঁজে না পেলে সমাধান আয়ত্বের বাইরে রয়ে যাবে। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, যারা এজাতীয় সাহায্যদানের কথা বলছেন তারা কেউই নিঃশর্তে সীমাহীন ভান্ডার খুলে দেননি — বরং, 'দাতা'-কথিত অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব-সাহায্য বিতরনে নিজের দখলী নিশ্চিত করতে অধিক আগ্রহী।

অর্থনীতির পরিভাষায় উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য নির্বিবাদে চলাচলের (স্থানান্তরের) সুযোগ থাকলে যে কোন স্থানের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুফল সংযুক্ত অন্যান্য এলাকাতেও পৌছুনোর কথা। অর্থাৎ ঢাকায় প্রবৃদ্ধি ঘটলে, খুলনার শ্রমিক সেখানে কাজের জন্য এসে অংশীদার হতে পারবেন এবং খুলনার ভোক্তারাও অতিরিক্ত পণ্য বিপণনের সুফলের ভাগীদার হতে

পারবেন। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এযুক্তি দেয়া হলেও সেখানে শ্রম-চলাচলে বিশাল অংকের আর্থিক খরচের বাইরেও ভিসা-নামক বাঁধা রয়েছে। একইসাথে, পণ্য-চলাচলে রয়েছে আমদানী শুল্ক সহ নানাবিধ বাঁধা-নিষেধ। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আইনের সেরুপ বাঁধা নেই; তবে যাত্রী ও পণ্য চলাচলে খরচ আছে যা দুটো এলাকার ভৌত-কাঠামো ভিত্তিক সংযুক্তির মাত্রার উপর নির্ভরশীল। এই চলাচল নিঃখরচায় নয় বলেই মজুরী আয় অথবা পণ্যের দাম এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় কম-বেশী হতে পারে; এবং ক্ষেত্রবিশেষে, এক এলাকার প্রবৃদ্ধি সমভাবে অন্য এলাকাসমূহে বিস্তৃত নাও হতে পারে। সাধারন বিচারে, পণ্য-বহনের খরচ কমলে আঞ্চলিক বৈষম্য কমার কথা; অথচ, শ্রম-চলাচলে খরচ কমলে আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়তে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে, দূরাঞ্চলের পণ্য (কম খরচে) অধিক সংযুক্তির ফলে বেশী দাম পাবে যা সেখানকার পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে, এবং যার পরিণতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে। অপরদিকে, শ্রমচলাচল সহজ হলে, দূরাঞ্চল থেকে অধিকসংখ্যক শ্রমিক কেন্দ্র-মুখী হবেন যা উন্নত এলাকার মজুরীর হার কমিয়ে অধিকতর প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে — যার পরিণতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অভিবাসন ও রেমিটেন্সের মাঝে সহজ-সরল সম্পর্ক না থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা দূষ্কর। তবে এটা সত্য যে বিদেশে শ্রম রপ্তানী করে কিছু কিছু এলাকা (যেমন, সিলেট ও চট্টগ্রাম) অধিক রেমিটেন্স পায় যা বিরাজমান আঞ্চলিক বৈষম্যকে বৃদ্ধি করেছে। এবিষয়ে অবশ্য কোন আলোচনা এখানে করা হয়নি।

শ্রম, কাঁচামাল বা পণ্যের ন্যায় উৎপাদনের অনেক উপকরণ (সম্পদ) সহজে চলাচল করতে পারে না এবং উৎপাদনে আবশ্যিক এজাতীয় কিছু সম্পদের বন্টন আঞ্চলিক বৈষম্যের মূল কারণ হতে পারে। যেমন, বাঁধ নির্মান করে জমির উৎপাদিকা বৃদ্ধি অথবা রাস্তা তৈরী করে বাজার-সংযুক্তি বৃদ্ধি একটি এলাকাকে অধিকতর উন্নত হবার সুযোগ দেয়। তাই এজাতীয় ভৌতকাঠামো নির্মানে সরকারী বিনিয়োগে পক্ষপাতিত্ব থাকলে তা আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বিশেষ জ্বালানী বন্টনের ক্ষেত্রেও একই মত প্রযোজ্য। ডিজেল তেল বা কয়লা সহজে স্থানান্তরযোগ্য — কিন্তু, বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পাইপলাইন-ভিত্তিক বিতরন নেট-ওয়ার্ক; এবং এজাতীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা ব্যয়বহুল। সঙ্গতঃকারণে, গ্যাসের উৎসস্থলের কাছাকাছি এলাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে; যা যমুনা সেতু চালু হবার আগে পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুরুতে সার উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার চালু হয়, এবং কারখানাগুলো পূর্বে অবস্থিত হলেও সারা দেশে একই দামে সার বিতরনের নীতির কারণে আঞ্চলিক বৈষম্যের কোনও হেতু ছিল না। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার এবং অন্যান্য শিল্পে ও বাণিজ্যে গ্যাস-ব্যবহার উন্মুক্ত করা হলে বিনিয়োগ আকর্ষণের মূল নিয়ামক হয় গ্যাসের সহজ প্রাপ্তি। একইসাথে গৃহ-ব্যবহার্যে গ্যাস প্রাপ্তি জীবন-যাত্রাকে সহজ করায় বিনিয়োগের জন্য আবশ্যিক দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তি গ্যাস-প্রাপ্তি'র সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে রাস্তা-ঘাটে (বিশেষত, গ্রামীন অবকাঠামোতে) ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে শ্রমের চলাচল সহজ হয়েছিল। কিন্তু, সেই তুলনায় রেল ও নদীপথ সুগম না হওয়ায় পণ্যবহনের খরচ কমেনি। গ্যাস ব্যবহারের শেষপর্যায়ে যানবাহনে সি,এন,জি চালু হয়, এবং এর দ্বারা উপকৃত এলাকায় পণ্য বহনের খরচ অনেক হ্রাস পায়। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।
অর্থাৎ, নদী-সৃষ্ট ভৌগলিক বিভাজনের কারণে, অথবা আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ উত্তর থেকে (খরা ও নদী-ভাঙ্গন) দক্ষিণে (সিডর বা আইল্যা) সরে আসায় আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। বরং, অবকাঠামোয় বিনিয়োগে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব, চলাচল-ব্যবস্থায় রাস্তা ও মোটরযান-নির্ভর নীতিমালা এবং গ্যাসের মত দূর্লভ সম্পদ ব্যবহারে সঠিক নীতিমালার অভাবের কারণে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেকক্ষেত্রে, প্রয়োজনের তাগিদে বা স্বল্প-মেয়াদী লক্ষে এসব নীতি নেয়া আবশ্যিক ছিল — তাই সেসবের ঢালাও বিচার করা এত স্বল্প-কথায় সমীচিন নয়। তবে উপরোক্ত আলোচনার জের ধরে নীতিনির্ধারকদের জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলবো।

- যদি ভবিষ্যতে গ্যাস উত্তোলন ও দেশের অভ্যন্তরে তা বিতরনের সম্ভাবনা থাকে, তার খাত-ওয়ারী ও অঞ্চল-ভিত্তিক সর্বোত্তম (পাইপ লাইন ভিত্তিক) বন্টন কি হওয়া উচিত ভেবে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রতিটি শহরে কি গ্যাস পৌছে দেয়া ঠিক, না কি, সার্বিক বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন-কেন্দ্র চিহ্নিত করে সেখানে গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা উচিত? বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঢাকা-কেন্দ্রিক নগরায়ন যে টেকসই নয়, তা প্রতিনিয়ত নগরবাসী উপলব্ধি করছে; এবং এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা জরুরী।
- এটা অনস্বীকার্য যে এক এলাকার অধিবাসী দূর্লভ সম্পদে অগ্রাধিকার পাওয়ায় অন্যদের তুলনায় অধিক লাভ করছে। শিল্পায়নে বৈষম্য আছে, তদুপরি, ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্তিতে বৈষম্য দেখা যায়। দক্ষিনাঞ্চলে ডিজেল-নির্ভর যাতায়তের খরচ নিঃসন্দেহে গ্যাস-চালিত যানবাহন থেকে বেশী। একইভাবে দক্ষিনাঞ্চলের একটি পরিবার যদি প্রতিমাসে সিলিন্ডার-গ্যাস বাবদ এক হাজার টাকার অধিক ব্যয় করে, তার থেকেও বেশী গ্যাস ব্যবহার করে ঢাকাস্থ একটি পরিবার মাত্র ৪৫০ টাকা দেয়। এজাতীয় ক্ষেত্রে সমতা আনার লক্ষে গৃহে-প্রাপ্ত গ্যাসের উপর অতিরিক্ত করারোপ করে সিলিন্ডার-গ্যাসে ভূর্তুকী দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা প্রয়োজন।
- পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে তুলনামূলকভাবে পণ্য-চলাচল সহজ হলে ও তার খরচ কমলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সকলেই স্বীকার করেন যে, অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে রেল ও জলপথে স্থানান্তর সুলভে সম্ভব। তাই এই দুই যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে অধিক বিনিয়োগ বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। একইসাথে উল্লেখ্য যে পণ্য-যাতায়তে চাঁদাবাজী সহ অন্যান্য হয়রানী দূর করা একান্তই আবশ্যিক।

- আধুনিক প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে শ্রমের স্থানান্তর না করে আজ অন্য এলাকার প্রবৃদ্ধির সুফল থানেকাংশে হলেও ভোগ করা সম্ভব। একইভাবে, উন্নয়নের সাথে সাথে অনেক নতুন সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায় (যেমন, পর্যটন), যার সরবরাহ নিশ্চিত করতে চিরচারিত উপকরণ (যেমন, জ্বালানী) আবশ্যিক নাও হতে পারে। এজাতীয় ভিন্নধর্মী সেবা সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলো গড়ে তোলা সম্ভব।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে সম্পদের সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবহার ও আঞ্চলিক সাম্যতার মাঝে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ পরিবার, গোষ্ঠী, দেশ, আন্তর্জাতিক — সম্পদ-বন্টনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তারপরও মানুষ সাম্যতা খোঁজে, কিন্তু কে কোথায় সে সাম্যতা খুঁজবে তা নির্ভর করে নিজ নিজ অবস্থানের উপর। যিনি বিশ্বব্যাপী বিচরণ করেন, তার দৃষ্টিতে ঢাকা-চট্টগ্রামের সীমিত করিডোরে দূর্লভ জ্বালানী সম্পদের ব্যবহার অধিক দক্ষ মনে হতে পারে। যিনি ভিন্ন বিচারে দেশের মাঝে সাম্যতা খুঁজবেন, তাকে ভিন্ন মাপকাঠিতে দূর্লভ সম্পদের বন্টন-নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তবে তিনিও সম্ভবত চাইবেন না, ঢালাওভাবে দূর্লভ সম্পদ ক্ষীণভাবে বিতরন করে তার ব্যবহারে অদক্ষতা বৃদ্ধি করতে। আমরা আশা করবো, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন এই দুইয়ের মাঝে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পান।

(সাজ্জাদ জহির, পরিচালক, ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ ।। ১১ ই জানুয়ারী ২০১০।। মূল গবেষণা কাজে অর্থায়নের জন্য ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোফ্যাইন্যান্স-এর প্রতি লেখক কৃতজ্ঞ।)